গল্প, যুক্তি ও উদাহরণের সাহায্যে **ঈমান সিরিজ**

# কুরআন কী বলে

নাফিউল হাসান
সিদ্দিক স্বপন

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

# ভূমিকা

আজকের শিশু-কিশোররা অনেক বেশি অগ্রসর। বিশ্বায়নের কারণে তারা এমন অনেক কিছু শিখছে, যা ওই বয়সে আমরা শিখতে পারিনি। এমন অনেক বিষয় নিয়ে তারা ভাবছে, ওদের বয়সে যা আমাদের মাথাতেই আসেনি। তারা এমন কিছু প্রশ্ন করে বসছে, যা হয়তো কখনোই আমাদের ভাবনায় নাড়া দেয়নি। শিশু-কিশোরদের এই অগ্রগামিতা একদিক থেকে যেমন প্রশান্তির, অন্যদিক থেকে তেমনি উদ্‌বেগের।

আপনি খেয়াল করলে দেখবেন, তাদের সামনে কোনো বিষয় অবতারণা করা হলে তারা বিনা প্রশ্নে তা মেনে নিচ্ছে না। এমনকি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়েও প্রশ্ন করতে ছাড় দিচ্ছে না।

শুনলাম ও মানলাম; এই উপদেশ যেন তাদের কাছে ফিকে বিষয়। এর পরিবর্তে তারা চায় যৌক্তিকভাবে মানতে, শুনতে। যেমন : আমরা যদি বলি, আল্লাহ এক। তারা পালটা প্রশ্ন করে—'আল্লাহ কেন এক?' যদি বলি ফেরেশতাদের কথা, তারা প্রশ্ন করে—'আমরা কেন ফেরেশতাদের দেখতে পাই না?' যদি বলি—মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই। সকল মানুষ সমান। তারা প্রশ্ন করে বসে—'তাহলে কেউ ধনী কেউ গরিব কেন হয়? কেন সাদা ও কালো বর্ণের এই রকমফের?'

এমন নানান প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হই আমরা। বিস্তর ধারণা না থাকায় হয়তো যৌক্তিক উত্তর দিতে পারি না। ফলে এর প্রভাব হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায় শিশুরা গোড়া থেকেই সংশয় ও সন্দেহ নিয়ে বেড়ে ওঠে। এতে প্রাপ্তবয়সে উপনীত হওয়ার পর সংশয়বাদিতায় ঝুঁকে যায় অনেকে। এমনকি ইসলামবিদ্বেষী মনোভাব দ্বারাও আক্রান্ত হয় কেউ কেউ।

কলিজার টুকরো সন্তানদের এমন ভয়াবহতা থেকে মুক্ত রাখতে তাদের হৃদয়ে উদ্ভূত প্রশ্নগুলোর যৌক্তিক উত্তর শৈশবেই সরবরাহ করতে হবে এবং এর ভাষা হবে তাদের উপযোগী।

আমাদের এই সিরিজটি ঈমানের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে শিশু-কিশোরমনে পুঞ্জীভূত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ। শিশু-কিশোররা হয়ে উঠবে একজন সংশয়মুক্ত সাচ্চা মুসলিম।

ঈমান সিরিজটি মোট চারটি খণ্ডে বিভক্ত—

১. এসো আল্লাহকে জানি

২. প্রিয়নবির পরিচয় এবং ফেরেশতা কারা

৩. কুরআন কী বলে

৪. পরকাল ও ভাগ্য কী

ঈমানে মুফাসসাল বা ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো এই সিরিজে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। শিশু-কিশোররা এতে যেমন ঈমানের শিক্ষা পাবে, তেমনি পাবে সাহিত্যপাঠের অমিয় স্বাদ, যা তাদের পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| কুরআনের ভাষা আরবি কেন | ৯ |
| না বুঝে কুরআন পড়লে কি সওয়াব হয় | ১৬ |
| কুরআনের ভাষা মানুষের ভাষার মতো কেন | ১৯ |
| কুরআন একত্রে নাজিল হয়নি কেন | ২২ |
| কুরআন অপরিবর্তনীয় থাকার নিশ্চয়তা কী | ২৪ |
| কুরআন কি সময়ের সাথে সাথে পুরোনো হয়ে যায় | ২৮ |
| কুরআনের ভবিষ্যদ্‌বাণী | ৩৩ |
| কুরআন কতটা বিজ্ঞানময় | ৪৭ |
| অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অমুসলিমদের কেন | ৫৩ |
| কুরআন কতটা কালজয়ী ও সর্বজনীন | ৬০ |
| কুরআন আমাদের কীভাবে শেখায় | ৬৪ |
| কুরআনের অভিধান | ৬৭ |

# কুরআনের ভাষা আরবি কেন

আসো, তোমাকে একটি মজার গল্প শোনাই। আমার কুরআন শেখার গল্প।

আলিফ, বা, তা, সা...এই ছিল কুরআন শেখায় আমার প্রথম পাঠ। শীত-গ্রীষ্মের রঙিন ছুটিতে ভোরবেলায় একটা কায়দা বা আমপারা বুকে জড়িয়ে ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে মক্তবের পথ ধরতাম। শিশির ভেজা পথ ধরে হেঁটে চলতাম মনের ভেতর একরাশ বিরক্তি নিয়ে। পাড়ার শিশু-কিশোররা দলবেঁধে একত্রিত হতাম মক্তবের বারান্দায়। ওস্তাদের অনুকরণে সুর করে উচ্চৈঃস্বরে চলত আমাদের আরবি পাঠ। এভাবে প্রতিদিন সকালে একঝাঁক শিশুর কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠত মক্তবের আঙিনা।

ওস্তাদ প্রত্যেকের নিকট থেকে পাঠ আদায় করে নিতেন। আমরা পড়তে গিয়ে অনেক অনেক ভুল করতাম। কিন্তু তিনি কখনোই বিরক্ত হতেন না; বরং আদর করে বুঝিয়ে দিতেন। এভাবে কায়দা, আমপারা শেষ করে একসময় কুরআন হাতে নিলাম। এরপর থেকে মক্তবে যেতে লাগলাম কুরআন বুকে জড়িয়ে।

সূরা ফাতিহা আগেই মুখস্থ করিয়েছিলেন মা। তাই আমার পড়া শুরু হলো সূরা বাকারা দিয়ে—আলিফ-লাম-মিম, জালিকাল কিতাবুউউউ...পড়তে প্রথম প্রথম বেশ ভয় পেতাম। ধীরে ধীরে তা অবশ্য কেটে গেল। এভাবে একসময় কুরআন খতম করলাম।

গ্রামাঞ্চলে কুরআন খতমের পর বড়ো আয়োজন হয়, জানো?

আমার বেলায়ও হলো। সেই আয়োজন শেষে মিষ্টি বিতরণ করা হলো সবার মাঝে। বেশ আনন্দের ছিল দিনটি। গর্বে বুক ভরে উঠেছিল আমার। কুরআন শেখার এই পথটা একটু হলেও কঠিন। অক্ষর চেনা, হরকত শেখা, বানান করে পড়া; নানা রকম নিয়ম।

অনেকেই ভাবে—কুরআন যদি আমাদের ভাষায় নাজিল হতো, তাহলে কতই-না ভালো হতো! আমিও এমনটাই ভাবতাম একটা সময়। তোমার মনে কি এমন ভাবনা এসেছে কখনো?

সত্যি বলতে, এটা অনেকেরই প্রশ্ন—কুরআনের ভাষা কেন আরবি?

এর সহজ উত্তর হলো, আমাদের প্রিয়নবি আরব ছিলেন। তাঁর ভাষা ছিল আরবি। তাই তাঁর ওপর এই ভাষায় কুরআন নাজিল করা হয়েছে। অন্য কোনো ভাষায় কুরআন নাজিল করা হলে তাঁর পক্ষে তা প্রচার করা সম্ভব হতো না। মক্কার লোকেরা কুরআনের ভাষা বুঝতে পারত না। ফলে সেখানকার কেউ ইসলাম গ্রহণও করত না।

তুমি আরও ভাবতে পারো, নবিজিকে আমাদের মাঝে প্রেরণ করা হলে কতই-না ভালো হতো! আল্লাহ তাঁকে প্রেরণের জন্য কেন যে আরব দেশকেই বেছে নিলেন!

এমন ভাবনা দোষের কিছু নয়।

আচ্ছা, একটু ভেবে দেখো তো, আমরা নিজেদের সুবিধার্থে আমাদের জাতির মাঝে রাসূল চাইলাম। কুরআন নাজিল হলো বাংলা ভাষায়। এরপর চীনা মুসলিমগণও তাদের জন্য একজন চাইনিজ রাসূল দাবি করল। এতে তাদের নিকট কুরআন নাজিল হলো চায়নিজ ভাষায়। তোমার জানার সুবিধার্থে বলি, চায়নিজ ভাষাকে মান্দারিন ভাষাও বলা হয়।

পাকিস্তানি, ভারতীয়, ইংরেজ ও অন্যান্য জাতির লোকেরাও এভাবে তাদের নিজের ভাষাভাষী রাসূল দাবি করতে পারে। এমন দাবির কি কোনো শেষ আছে, তুমিই বলো!

না, নেই।

এই সমস্যার সমাধান হিসেবেই আল্লাহ সকল জাতির মধ্য থেকে একটি জাতি নির্বাচন করেছেন। সকল ভাষার মধ্য থেকে নির্বাচন করেছেন একটি ভাষা। আর সেখানে সে ভাষাতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। এটা একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী হয়েছে।

ঠিক যেভাবে তিনি আকাশকে নীল, বাতাসকে স্বচ্ছ, বনানীকে সবুজ করে সৃষ্টি করেছেন। পাথরকে করেছেন শক্ত। পাহাড়কে করেছেন সুদৃঢ়। রংধনুকে করেছেন সাত রঙা। এটা বলার সুযোগ নেই—আকাশকে কেন কমলা, বাতাসকে কালো, বনকে নীল করে সৃষ্টি করা হলো না? কেন পাথরকে নরম, ধুলোবালিকে শক্ত, রংধনুকে পাঁচ রঙা করা হলো না?

এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। একেকজন একেক বিষয় চাইবে। তাই আল্লাহর ফয়সালাই উত্তম। তিনিই ঠিক করেছেন—পাখির ডানা থাকবে, হাতির থাকবে শুঁড়, ফুলের থাকবে সুঘ্রাণ।

কাউকে কি কখনো বলতে শুনেছ—পাখির শুঁড় থাকলে ভালো হতো, হাতির ডানা থাকা কী দরকার ছিল? এমন কথা বলার অধিকার বা সুযোগ কারও নেই। কাকে কীভাবে সৃষ্টি করা প্রয়োজন, এটা ঠিক করার এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর।

আল্লাহ কাউকে ইচ্ছেমতো উড়ে বেড়ানোর জন্য পাখা দিয়েছেন। কাউকে সাঁতার কাটার জন্য দিয়েছেন পাখনা। কাউকে দিয়েছেন দ্রুতগতিতে দৌড়ানোর বলিষ্ঠ পা। আমাদের সকলের স্রষ্টা আল্লাহর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। নবিজিকে আরব দেশে পাঠানো হবে, কুরআনের ভাষা হবে আরবি; এগুলো তাঁরই ফয়সালা। আমাদের এ নিয়ে আপত্তি তোলার কোনো অধিকার নেই।

আল্লাহ প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন; বরং আমাদের উচিত গবেষণা করে তাঁর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের বিভিন্ন দিক উদ্‌ঘাটন করা।

### বাংলায় কুরআন পড়াই কি যথেষ্ট

বাংলা কুরআন বলতে মূলত বোঝায় কুরআনের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ থেকে পড়ার অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে একটি হলো, মূল লেখার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়া।

পৃথিবীতে এমন অনেক বিখ্যাত লেখকের বই আছে, যা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। আবার এমন অনেক পাঠকও আছেন, যারা কেবল প্রিয় লেখকের লেখা মূল ভাষায় পড়ার জন্য তার ভাষা শিখে ফেলেছেন। কারণ, অনুবাদ কখনোই মূল লেখার স্বাদ দিতে পারে না।

অনেকেই ফ্রেঞ্চ ভাষা শিখে থাকেন ভিক্টর হুগো পড়ার জন্য। গোথে পড়ার জন্য অনেকেই শেখেন জার্মান ভাষা, যেন তার লেখার রস ও মর্ম পূর্ণরূপে আস্বাদন করা যায়।

আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে আল্লাহর প্রেরিত কিতাব। এক্ষেত্রে কুরআন এবং এর অনুবাদের মধ্যে মানগত পার্থক্য অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ, কুরআনে আল্লাহ প্রত্যেকটি শব্দচয়ন করেছেন তাঁর মহান জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে। কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে সেই শব্দের অর্থ হিসেবে কোন শব্দ গ্রহণ করা হবে, তা অনুবাদক নিজের সীমিত জ্ঞানের ভিত্তিতে ঠিক করে থাকেন।

সুতরাং কুরআনের অনুবাদ এবং মূল কুরআন কখনো সমান হতে পারে না। তাই বলে অনুবাদ পাঠের গুরুত্বকে ছোটো করে দেখার সুযোগ নেই কিন্তু! বরং একজন মুসলিম পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, তার কাছে নিজের ভাষায় কুরআনের একটি অনুবাদ থাকা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ কুরআনে কুরআন সম্পর্কে বলেছেন—

> ‘এটি মানুষের জন্য একটি বার্তা।’ সূরা ইবরাহিম : ৫২

সুতরাং বুঝতেই পারছ, কুরআন শুধু আরবদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকার জন্য আসেনি; বরং এটি সমগ্র মানবজাতির প্রতি আল্লাহর একটি চিঠি। ঠিক যেমন আমাদের প্রিয় রাসূল সমগ্র মানবজাতির রাসূল। তাই এই কুরআন পড়া ও বোঝার প্রচেষ্টা চালানো আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য।

কিন্তু সকল মানুষ আরবি ভাষা পারে না। তাই কুরআন বুঝতে হলে হয় সবাইকে আরবি ভাষা শিখতে হবে, নতুবা আরবি কুরআনকে সকল ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।

দ্বিতীয় পন্থাটি অপেক্ষাকৃত সহজ ও বাস্তবভিত্তিক। সে কারণেই পৃথিবীতে মানুষ যত ভাষায় কথা বলে, মোটামুটি সব ভাষাতেই কুরআনের অনুবাদ পাওয়া যায়। মুসলিম-অমুসলিম, যে কেউ চাইলেই কুরআনের অনুবাদ পড়তে পারে।

প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ শুধু অনুবাদ পাঠের মাধ্যমে কুরআনের সত্য অনুধাবন করতে পারছে এবং ইসলাম গ্রহণ করছে। তুমি কি উদাহরণ চাও?

উদাহরণ কোনো কিছু বুঝতে ভালো সহায়তা করে।

বিখ্যাত পপ সংগীতশিল্পী কেট স্টিভেনের নাম শুনেছ? তিনি শুধু সূরা ইউসুফের অনুবাদ পাঠ করেছিলেন। এতে এতটাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিলেন যে, মুহূর্তকাল অপেক্ষা না করে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়—কুরআন এমনই অলৌকিক শক্তির অধিকারী একটি গ্রন্থ, যার অনুবাদ পড়লেও মানুষের চিন্তায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে পারে।

এ এক সূর্য, যার আলোকরশ্মিকে গোপন করার সাধ্য কারও নেই। এর আলোকরশ্মি পৃথিবীর সকল ভাষার মাঝে আয়নার মতো প্রতিফলিত  হয়ে পৌঁছে যায় মানুষের অন্তরের গহিনে। আলোকিত করে দেয় তার ভেতর-বাইর।

তাহলে শুধু অনুবাদ পড়াই কি যথেষ্ট?

'কুরআনের অনুবাদ হাতের কাছে থাকলে মূল কুরআনের কীই-বা প্রয়োজন?'— অনেকেই এমনটা মনে করেন। এমন ভাবনা সঠিক কি না, চলো একটু বোঝার চেষ্টা করি।

আচ্ছা, তার আগে জিজ্ঞেস করে নিই—তুমি মনোযোগ দিয়ে কুরআন পড়ছ তো?

কুরআনের অধ্যায়গুলো ভালোভাবে বোঝার জন্য মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে কিন্তু! না হলে অনেক কিছুই বুঝতে পারবে না। আর না বুঝলে তোমার বন্ধুদেরও ব্যাপারগুলো বোঝাতে পারবে না।

তুমি নিশ্চয় চাও—তোমার বন্ধুরাও এগুলো জানুক, তাই না?

চলো এবার সামনে এগোই।

একটি সুউচ্চ প্রাসাদের কথা কল্পনা করা যাক। এর দেওয়ালগুলো সুন্দর কারুকার্যখচিত। সুন্দর দরজা, মিনার ও গম্বুজ দিয়ে সুসজ্জিত। দেওয়ালে মূল্যবান পাথরের গাঁথুনি। এমন একটি প্রাসাদ বাইরে থেকে দেখতেই চোখ জুড়িয়ে যাবে, তাই না?

মনোরম প্রাসাদ দেখতে কী অসাধারণ যে লাগে!

প্রাসাদের ভেতরে মূল্যবান আর দামি আসবাবপত্র, ঝাড়বাতি, বিভিন্ন রকমের পাত্র, রত্নভান্ডার, দামি নকশা, শিল্পকর্ম ইত্যাদি; যার সৌন্দর্যের কাছে প্রাসাদের বাইরের সৌন্দর্য নান্দনিকতা বই আর কিছুই নয়!

এমন একটি প্রাসাদের ভেতরের সৌন্দর্য যদি আমরা দেখতে চাই, কী করতে হবে বলো তো? নিশ্চয় ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। বাইরে থেকে দেখে কতটুকুই-বা উপলব্ধি করা যায়!

তুমি কি বুঝতে পারছ, আমি কোন প্রাসাদের কথা বলছি?

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ। আমি কুরআনের কথাই বলছি। কুরআনের ভেতর আল্লাহ এমন এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা রেখে দিয়েছেন, যা ওপরের কল্পনা করা প্রাসাদের ভেতরের অমূল্য রত্নভান্ডারের সমতুল্য।

অনুবাদ হচ্ছে কুরআনের একটি ছায়া মাত্র। রোদে আমরা যেমন নিজের ছায়া দেখতে পাই, অনুবাদের ব্যাপারটাও তেমন। অনুবাদ কুরআনের ছায়া, কিন্তু মূল কুরআন নয়। এর মাধ্যমে কুরআনের বাইরের সৌন্দর্য উপভোগ করা চলে, কিন্তু এর ভেতরের অমূল্য জ্ঞান, রূপ-সৌন্দর্যকে স্পর্শ করা যায় না।

এর ভান্ডারে প্রবেশ করতে হলে অনুবাদ যথেষ্ট নয়। তখন আমাদের অর্থ বুঝতে হবে। কুরআনের অর্থ হচ্ছে কুরআনের প্রাসাদের প্রবেশমুখ। এখন তোমার মাথায় নিশ্চয় একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে—'তাহলে কুরআনের ভেতরের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বোঝা যাবে কীভাবে?'

অসংখ্য বিজ্ঞ আলিম ও গবেষক হাজার বছর ধরে কুরআনের ব্যাখ্যা করে আসছেন। কুরআনের এই ব্যাখ্যাগুলোকে বলে তাফসির। তাফসির পড়লে কুরআন বোঝা সহজ হয়। সমগ্র কুরআন ভালো ও বিস্তারিতভাবে জানা যায়।

তাফসির হচ্ছে একটি মানচিত্র। এর সাহায্যে আমরা কুরআন নামক সুবিশাল প্রাসাদে ঘুরে বেড়াতে পারি। এর প্রতিটি বাক্য বুঝতে পারি। তাফসিরে থাকে কুরআনের প্রতিটি আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা। অনুবাদের মাধ্যমে এই ব্যাখ্যা তুলে ধরা সম্ভব নয়।

কথাগুলো বেশি কঠিন হয়ে যাচ্ছে কি?

বুঝেছি! উদাহরণ দিলে বুঝতে সহজ হবে। আর শুরুতেই মনোযোগ ধরে রাখার কথা বলেছিলাম। মনোযোগ হারালে চলবে না কিন্তু!

তুমি কি কখনো কক্সবাজারে সমুদ্র দেখতে গিয়েছ? সমুদ্রের কত উঁচু উঁচু ঢেউ! দেখলেই শরীরে শিহরন জাগে, তাই না? কী সুবিশাল পানির আধার!

কুরআনের অনুবাদ বা শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ঠিক সমুদ্রপৃষ্ঠের মতো। সমুদ্রের দিকে তাকালে কী দেখা যায় বলো তো? শুধু পানি আর পানি। এর বিশালতায় আমরা অভিভূত হয়ে যাই। হারিয়ে যাই এর নীল জলরাশি আর ঊর্মিমালার সৌন্দর্যে।

তুমি কি জানো—সূর্য আর চাঁদের পালাবদলে সমুদ্রপৃষ্ঠের সৌন্দর্যও রূপ পালটায়? সূর্যোদয়ের সময়, দুপুরে ও সূর্যাস্তের সময় সমুদ্রের রূপ ও রং থাকে একেক রকম। আবার রাতে আকাশের চাঁদ সমুদ্রের আরেকটি ভিন্ন রূপ নিয়ে হাজির হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠের এই রূপ এতটাই মনোমুগ্ধকর যে, তা আমাদের কল্পনাকেও হার মানায়।

কিন্তু সমুদ্র কি শুধু এতটুকুই? সমুদ্রপৃষ্ঠে যে জলরাশি আমরা দেখতে পাই, এটাই কি পুরো সমুদ্রের সবটুকু?

না, আমরা খালি চোখে সমুদ্রপৃষ্ঠকেই দেখি মাত্র।

সমুদ্রের পানির নিচে রয়েছে আলাদা একটা জগৎ, যা আরও সুন্দর, আরও রঙিন, আরও বিচিত্র, আরও ব্যাপক। এই অপরূপ জগৎ আমাদের চেনাজানা জগতের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। তবে সমুদ্রের গভীরে না গেলে তা সরাসরি জানার বা দেখার কোনো উপায় নেই। বোঝার উপায় নেই—তা কতটা মোহনীয়।

কুরআন হলো জ্ঞানের সমুদ্র। আর অনুবাদ হচ্ছে জ্ঞানসমুদ্রের পৃষ্ঠের মতো। তাই কেউ যদি সিদ্ধান্ত নেয়—আজ থেকে সে কেবল অনুবাদ পড়েই কুরআন বুঝবে এবং সে অনুযায়ী চলবে, তাহলে তার এমন সিদ্ধান্ত সঠিক হবে না। এর মাধ্যমে সে নিজেকে কুরআনের মূল স্বাদ আস্বাদন করা থেকে বঞ্চিত করবে। কারণ, অনুবাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ নয়।

তাই আমাদের অনুবাদের পাশাপাশি তাফসিরকারকগণের লিখে যাওয়া তাফসির পড়তে হবে। সেইসাথে পড়তে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসও। এভাবেই আমরা কুরআনের জ্ঞান পরিপূর্ণরূপে লাভ করতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

# না বুঝে কুরআন পড়লে কি সওয়াব হয়

আমরা খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী হলে একটা বড়ো আফসোস থেকে যেত। সেটা হলো, নিজের ধর্মগ্রন্থ নাজিলকৃত ভাষায় তিলাওয়াত করতে না পারা। ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর যে ভাষায় ইনজিল নাজিল হয়েছিল, এখন সেই ভাষায় কেউ ইনজিল পড়ে না।

ঈসা আলাইহিস সালাম আর্মাইক ভাষায় কথা বলতেন। তাই তাঁর নিকট ইনজিল প্রেরিত হয়েছিল আর্মাইক ভাষায়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেই ভাষা ও ইনজিল; উভয়ই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল ইনজিলেরই পরিবর্তিত রূপ। খ্রিষ্টানদের ধর্মগুরুরা বিভিন্ন সময়ে নিজেদের সুবিধামতো এটিকে পরিবর্তন করে নিয়েছে।

বাইবেল সর্বপ্রথম গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এর দীর্ঘদিন পর খ্রিষ্টান পোপ ল্যাটিনকে 'পবিত্র ভাষা' বলে স্বীকৃতি দেন। বর্তমানে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র শহর ভ্যাটিকান সিটিতে সংরক্ষিত বাইবেলের ভাষা হচ্ছে ল্যাটিন। খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন ধরনের প্রার্থনাগুলোও ল্যাটিন ভাষায় করতে হয়। অথচ আর্মাইক ভাষা তাদের ধর্মীয় ভাষা হওয়ার কথা ছিল। খ্রিষ্টানদের নিকট এটা একটা আফসোসের বিষয় বটে, তাই নয় কি?

সেদিক বিবেচনায় আমরা মুসলিমরা আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শেষ করতে পারব না। কারণ, ঠিক যেভাবে এবং যে ভাষায় কুরআন নাজিল হয়েছে, আমরা সেভাবে এবং সে ভাষাতেই তা তিলাওয়াত করতে পারছি।

আজ থেকে সাড়ে ১৪০০ বছর আগে হেরা গুহায় জিবরাইল আলাইহিস সালাম নবিজির নিকট প্রথম ওহি নিয়ে হাজির হন। ওহির প্রথম আয়াত ছিল—'ইকরা বিসমি রব্বিকাল্লাজি খলাক...'

আজ একজন মুসলিম পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন, যে ভাষাতেই কথা বলুন না কেন, তিনি সেই নাজিলকৃত আয়াত একই উচ্চারণে পড়তে পারেন। একই উচ্চারণে শুনতে পারেন পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের যেকোনো ক্বারির তিলাওয়াত।

বর্তমানে আমাদের নিকট যে কুরআন রয়েছে তার শব্দ, বাক্য, উচ্চারণ ঠিক তেমনই আছে, যেমনটা মহান আল্লাহ জিবরাইল আলাইহিস সালামকে দিয়ে নবিজির নিকট পাঠিয়েছিলেন।

আল্লাহর কী রহমত! কুরআনকে আমরা কুরআনের ভাষায় পড়তে পারছি, সুবহানআল্লাহ।

ইসলামের সাধারণ ভাষা হচ্ছে কুরআনের ভাষা। একজন মুসলিম অপর মুসলিমকে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনলেই বুঝে ফেলবেন—কী পাঠ করা হচ্ছে; তিনি যে জাতির, যে ভাষারই হোন না কেন। আমরা হয়তো আরবি ভাষায় কথা বলতে পারি না। কিন্তু আমাদের সকলের কাছে আরবি ভাষা অতি পরিচিত একটি ভাষা।

পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের যেকোনো ইমামের পেছনে আমরা অবলীলায় নামাজে দাঁড়িয়ে যেতে পারি। হোন তিনি চাইনিজ বা ভারতীয়; ইংরেজ  বা মিশরীয়, তাতে আমরা কখনো ভ্রুক্ষেপ করি না। আরবি ভাষায় কুরআন পাঠ করার সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হচ্ছে এটিই—জাতি, ভাষা, স্থান, কালনির্বিশেষে যেকোনো পরিস্থিতিতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নামাজ পড়তে পারি।

আমাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হচ্ছে নামাজ। নামাজ পড়তে হলে সূরা ফাতিহা, কিছু ছোটো ছোটো সূরা, কিছু বড়ো আয়াত আত্মস্ত থাকা বাধ্যতামূলক। এই কাজটি অবশ্য এত কঠিন নয়। সালাতের নিয়ম এবং জরুরি সূরা ও দুআ-দরুদ শেখা নামতা মুখস্থ করার চেয়েও সহজ।

কুরআনের শেষ পারায় কিছু ছোটো ছোটো সূরা রয়েছে, যেগুলো অবলীলায় মুখস্থ করে ফেলা যায়। যেমন : সূরা কাউসার, সূরা ইখলাস, সূরা ফিল ইত্যাদি। সাধারণত সহজ ও ছোটো হওয়ার কারণে এই সূরাগুলোই সালাতে বেশি পাঠ করা হয়ে থাকে।

এ ছাড়াও নামাজে আমরা যেসব সূরা পড়ি, সেগুলোর অর্থ জানাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ না জানা থাকলেও নামাজ শুদ্ধ হবে, কিন্তু জানা থাকাটা নামাজে মনোযোগ বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। যে সূরাগুলো আমরা প্রত্যেক নামাজে, প্রত্যেক রাকাতে পড়ে থাকি, সেগুলোর অর্থ জানা না থাকাটা আমাদের জন্য কিছুটা লজ্জার ব্যাপার নয় কি? অথচ সামান্য চেষ্টা করেই আমরা এগুলোর অর্থ জেনে নিতে পারি।

কুরআন তিলাওয়াত করা একটি ইবাদত। আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'কুরআনের প্রতিটি বর্ণের জন্য পাঠকারীর আমলনামায় নেকি যোগ করা হয়।'

রমজান মাসে এই নেকি আরও বৃদ্ধি পায়। আর বিশেষ করে কদরের রাতে নেকির সংখ্যা লক্ষ লক্ষ গুণ বেড়ে যায়। তাই কুরআন তিলাওয়াত একটি সহজ ও লাভজনক আমল। নবিজি তাঁর উম্মতকে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত এবং এর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির তাগিদ দিয়ে বলেছেন—'তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শিক্ষা দান করে।'

'তোমরা বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করো। তাঁর শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! বাঁধন ছেড়ে দিলে উট যত দ্রুত পালিয়ে যায়, অন্তর থেকে কুরআন এর চেয়ে অধিক দ্রুত হারিয়ে যায়।'

'কুরআন তিলাওয়াতকারী মুমিনের উপমা হচ্ছে এমন উৎকৃষ্ট লেবুর ন্যায়, যা সুঘ্রাণযুক্ত এবং খেতে সুস্বাদু। আর যে কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার উপমা হচ্ছে খেজুরের ন্যায়, যা খেতে সুস্বাদু, কিন্তু সুগন্ধহীন।'

# কুরআনের ভাষা মানুষের ভাষার মতো কেন

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই; যিনি আমাদের কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন, তিনি নিজে অবশ্যই কথা বলতে পারেন। কিন্তু তাঁর কথা আমাদের মতো নয়। আমরা কথা বলার জন্য ঠোঁট, জিভ, দাঁত ব্যবহার করে থাকি। এই অঙ্গগুলো দিয়ে বাতাসের সাহায্যে আমরা শব্দ উচ্চারণ করি। আমাদের মস্তিষ্কও এক্ষেত্রে অনেক বড়ো ভূমিকা পালন করে।

আল্লাহ যদি আমাদের মতো করে কথা বলতেন, তাহলে তাঁরও এ রকম অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রয়োজন হতো। কিন্তু তিনি এমন এক সত্তা, যার কথা বলার জন্য এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রয়োজন হয় না। তিনি সকল প্রকার প্রয়োজনের অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।

এখন তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—আল্লাহর প্রেরিত কিতাব কুরআনের ভাষা, শব্দ, উচ্চারণ মানুষের ভাষার ন্যায় কেন? আল্লাহর ভাষা কি আমাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হওয়ার কথা ছিল না?

আমাদের চোখ যেমন সব ধরনের আলোকরশ্মি দেখতে পায় না, তেমনি কানও সব ধরনের শব্দতরঙ্গ শুনতে পায় না। আবার শুনতে পেলেও মস্তিষ্ক সব সময় তা বুঝতে পারে না।

একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

সন্ধ্যায় ঝোপঝাড়ের মাঝে যে ঝিঁঝি পোকারা ডাকে, তাদের ভাষা কি আমরা বুঝতে পারি? মৌমাছিরা যে ভাষায় নিজেদের মাঝে ভাব বিনিময় করে, আমরা কি সে ভাষা বুঝতে পারি? পাখিরা কত বিচিত্র সুরে ডাকে! আমরা কি বুঝতে পারি, তারা নিজেদের মাঝে কী নিয়ে আলাপ করে?

আচ্ছা, প্রাণীদের ভাষার কথা বাদ দিলাম। আমরা যে ভাষা শুনে অভ্যস্ত, সে ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় কথা বললে কি বুঝতে পারি? ধরো তোমার সামনে কোনো ব্যক্তি জাপানি ভাষায় কথা বলছে। তুমি জাপানি ভাষা না জানলে কি তার কথার অর্থ বুঝতে পারবে?

এ কারণেই আল্লাহ কুরআনে আমাদের বোঝার উপযোগী ভাষা ব্যবহার করেছেন, যেন আমরা সহজেই বুঝতে এবং অনুসরণ করতে পারি। তিনি যদি তাঁর মহিমা-গরিমা ও শান-শওকতের পর্যায়ের ভাষা ব্যবহার করতেন, তাহলে আমরা তা কখনোই বুঝতে পারতাম না।

মা তার শিশু সন্তানের সাথে কথা বলার সময় ছোটো ও সহজ শব্দ ব্যবহার করেন, যেন সে তার কথা বুঝতে পারে। সেই মা যদি একজন উঁচুমাপের ভাষাপণ্ডিতও হন, তবুও তিনি তার শিশুর সাথে সেই পাণ্ডিত্য চর্চা করতে যাবেন না। সন্তানের প্রয়োজনে তিনি তার সকল পাণ্ডিত্য, জ্ঞান-গরিমাকে একপাশে রেখে সহজ-সাবলীল ভাষা বেছে নেবেন।

এটা যেমন সন্তানের প্রতি মায়ের মমত্বের নমুনা, ঠিক তেমনি মানুষের বোঝার উপযুক্ত ভাষায় কুরআন পাঠানোও বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

কুরআনের ভাষা মানুষের ভাষার অনুরূপ হওয়ার কারণেই তারা বুঝতে পারে, উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এবং তা কাজে লাগিয়ে জীবনকে করতে পারে আলোকিত। মহান আল্লাহ স্নেহপরবশ হয়ে আমাদের বোধগম্য ভাষায় কুরআন না পাঠালে আমরা চিরদিন এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থেকে যেতাম।

তুমি জানলে অবাক হবে, নবিজির সময়ে যারা অভিযোগ তুলেছিল—'কুরআন আল্লাহর প্রেরিত হলে এর ভাষা মানুষের ন্যায় হতো না', তারা তাঁর ব্যাপারেও আপত্তি তুলে বলেছিল—'মুহাম্মাদ যদি সত্যিই রাসূল হয়ে থাকেন, তাহলে মানুষের ন্যায় চলাফেরা করেন কেন? মানুষের ন্যায় খাবার খান, ঘুমান এমনকি অসুস্থও হন! নবি হলে তাঁর তো ফেরেশতাদের মতো হওয়ার কথা ছিল!'

অথচ পৃথিবীতে নবি-রাসূল প্রেরণের ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—তাঁরা যেন মানুষের জীবনের সকল ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। খারাপ অভ্যাস, রীতি-রেওয়াজকে পরিবর্তন করে সেখানে প্রতিস্থাপন করতে পারেন ভালো অভ্যাস। আর যিনি মানুষের মাঝে আদর্শ স্থাপনের কাজ করবেন, তিনি মানুষ না হয়ে অন্য কিছু হলে মানুষ কী করে তাঁকে অনুসরণ করবে?

তুমি নিশ্চয় জানো—ফেরেশতাদের খাবার বা ঘুমের প্রয়োজন হয় না। আমাদের পক্ষে কীভাবে এমন কারও অনুসরণ করা সম্ভব, যিনি খান না, ঘুমান না?

ঠিক তেমনি, কুরআন প্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেওয়া। ঠিক-বেঠিক, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান শেখানো। মানুষ যদি সেই কুরআন পড়ে না বুঝতে পারে, তাহলে প্রধান উদ্দেশ্যই বিফল হয়ে যাবে।

এখন তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—'কুরআনের ভাষা মানুষের ভাষার ন্যায়, বুঝলাম! তাহলে কেন বলা হয় কুরআনের মতো আর কোনো গ্রন্থ নেই? কেন এর সমপর্যায়ের কোনো গ্রন্থ লেখা সম্ভব নয়? মানুষের ভাষাতেই লেখা একটি গ্রন্থ অথচ এর মাঝে বিস্ময়ের এমন কী আছে যে, অন্য কোনো কিছু এর সামনে দাঁড়াতেই পারে না?'

আচ্ছা বলো তো, আমরা মাটি দিয়ে কী করি? ঘাঁড়ি-পাতিল, ভাস্কর্য ইত্যাদি তৈরি করি, তাই না?

আল্লাহ মাটি দিয়ে কী করেন, জানো?

তিনি মাটি থেকে বৃহৎ গাছ, নানা রঙের শাকসবজি, ফলফলাদি সৃষ্টি করেন। আরও সৃষ্টি করেন ডুমুর, জলপাই, ডালিম। বিভিন্ন রকমের পশুপাখি, জলজ প্রাণী এমনকি সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিস্ময় মানুষ সৃষ্টি করেন।

তার মানে কি আমাদের সৃজনক্ষমতা আর আল্লাহর সৃজনক্ষমতা এক? না নিশ্চয়। বরং এ দুয়ের মাঝে যে ফারাক বিদ্যমান, তা কল্পনাতীত, অবর্ণনীয়। তেমনিভাবে আমরা যে শব্দ দিয়ে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ রচনা করি, সেই শব্দ দিয়েই আল্লাহ কিতাব রচনা করেছেন। কিন্তু সেই কিতাবের মতো কোনো কিতাব রচনা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

আমরা আল্লাহর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। কারণ, তিনি দয়া করে আমাদের নিকট তাঁর আদেশ-উপদেশ ও দিকনির্দেশনাসংবলিত কিতাব প্রেরণ করেছেন; যা আমরা পড়তে পারি, বুঝতে পারি এবং অনুসরণ করতে পারি।

এতে বর্ণিত সুসংবাদ আমাদের আনন্দিত করে এবং সতর্কবার্তা আমাদের সাবধান করে দেয়। এর মাধ্যমে আমরা পরকালের জীবন, জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে জানতে পারি। এই কিতাবের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে আমরা আমাদের ইহকাল ও পরকালকে করতে পারি আলোকিত।